ভগিনী নিবেদিতার জীবনে বুদ্ধ

প্রব্রাজিকা বিদ্যাত্মপ্রাণা

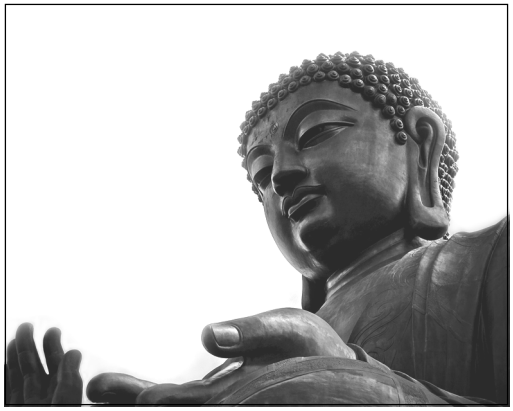

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির দিন, দুপুরবেলা। বহুদিন রোগে ভুগে তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ, বিছানায় উঠে বসার সামর্থ্যও আর নেই। কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে তিনি পুরো দুঘণ্টা 'যোগ' সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন একশো মাইল দূর থেকে আসা এক জিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে। সেই ব্যক্তি পরম তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। এর কিছুক্ষণ পরই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শারীরিক অবস্থার খুব অবনতি হল—সেবক শশিভূষণ ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের চোখের সামনে ভেসে উঠল আর এক মহাপুরুষের জীবনের অন্তিম সময়ের ছবি। কুশীনগরের এক শালবনে ভগবান বুদ্ধ ডানপাশ ফিরে শুয়ে আছেন—মহানির্বাণের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ একজন ছুটে এল তাঁর কাছে, সে উপদেশ চায়। শিষ্যরা সেই লোকটিকে সরিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আচার্যের শান্তি যেন বিঘ্নিত না হয়। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের কথাবার্তা শুনতে পেলেন, বললেন—না, না, ওকে আসতে দাও। তথাগত সদা প্রস্তুত! তারপর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঠে তাকে উপদেশ দিলেন। এমন ঘটনা ঘটল পরপর চারবার। তারপর বুদ্ধ প্রস্তুত হলেন নির্বাণের জন্য। হ্যাঁ, এবার তিনি মুক্ত। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের এই পর্বটি যেন আবার অভিনীত হল প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে—কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধের অসাধারণ ত্যাগ ও স্বার্থশূন্যতার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষদিনের এই ঘটনাটি বলেছিলেন নিবেদিতা ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে।

স্বামীজীর কাছে বুদ্ধ ছিলেন জগতের ইতিহাসের 'মহত্তম চরিত্র', কর্মযোগের আদর্শের মূর্ত বিগ্রহ—''বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন।... মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।' ''[১] সাধারণ মানুষের কাছে এর চেয়ে সরল উপদেশ আর কী হতে পারে?

বুদ্ধদেবের বাণী যেমন বহু বছর আগে বিশ্বকে শান্তির পথ দেখিয়েছিল, তেমনই আরও একবার

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে মহত্তম ভাবসমূহ জগৎময় ছড়িয়ে পড়বে, জগতে সূচনা হবে সত্যযুগের—স্বামীজীর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই সত্য ধরা পড়েছিল। জীবনের শেষ কয়েক বছরে সেই ভাবী সত্যযুগের আভাস তিনি পেয়েছিলেন— "Within ten years of his passing away this power has encircled the globe."[২] তাঁর 'Master as I Saw Him' গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণ নির্দেশ করে লিখেছেন, স্বামীজীর ''প্রত্যক্ষদৃষ্ট গুরুদেবের জীবনের সঙ্গে আড়াই হাজার বছর আগেকার এই সর্বজনস্বীকৃত ইতিহাসের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধের জীবনে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে; শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তিনি দেখেছিলেন ভগবান বুদ্ধকে।"[৩]

নিবেদিতা শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূলশরীরে প্রত্যক্ষ করেননি, কিন্তু বুদ্ধজীবনের মহত্তম আদর্শকে প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন নিজের গুরু স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। বিবেকানন্দের কাছে, ''বুদ্ধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, অবস্থাবিশেষের নাম; যে-কেউ সেই অবস্থায় পৌঁছতে পারে।"[৪] তাই দেখা যায় আইরিশ শিষ্য মার্গারেটকে দীক্ষিত করার সময় (২৫ মার্চ ১৮৯৮) তাঁর সামনে আদর্শ হিসাবে রেখেছেন বুদ্ধকে, বলেছেন : ''যাও, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচ শত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।"

বিবেকানন্দ এবং তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতা—দুজনের জীবনেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধদেবের অপরিসীম প্রভাব। বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ, তখন তিনি নিজের ঘরে বুদ্ধের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, সন্ন্যাস-জীবনের শুরুতে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং বুদ্ধগয়ায় গিয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন, আবার জীবনের শেষ তীর্থযাত্রা করেন সারনাথে।

একইভাবে, স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে মার্গারেটের মন যখন ধর্মবিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন ও সংশয়ে অস্থির, তখন এডউইন আরনল্ড-এর বুদ্ধের ওপর লেখা 'Light of Asia' বই থেকে তিনি প্রথম আলোর সন্ধান পান। বিদুষী মার্গারেটের কাছে খ্রিস্টধর্মের উপদেশাবলির থেকে বুদ্ধের মুক্তির তত্ত্ব অনেক বেশি সত্য ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী এরিক হ্যামন্ড লিখেছেন, এসময় বুদ্ধদেবের বাণী তাঁকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, ''তাঁর (ক্রিশ্চান) ছাত্রীদের অভিভাবকেরা অনেকসময় তাঁর ভাবগতিকে আহত হতেন। যেমন ধরা যাক, নিজের স্টুডিও-র ম্যান্টল পিসের ওপর ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি রাখলেন। কিছুতেই সরালেন না।"

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষিত দিন—মার্গারেটের কাছে এসে পৌঁছল স্বামীজীর অমোঘ আহ্বান—১৮৯৬-এর ৭ জুনের চিঠি :

Dear Miss Noble,

My ideal can be put into a few words... Buddhas by the hundred are necessary, with eternal love and pity..."

গুরুনির্দিষ্ট ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন মার্গারেট। স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে পাড়ি দিলেন 'বুদ্ধের দেশ' ভারতবর্ষে। ভারতে পৌঁছনোর কয়েক মাস পরে স্বামীজী নিবেদিতা ও তাঁর আরও দুই পাশ্চাত্য শিষ্যা মিস ম্যাকলাউড, মিসেস সারা বুল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে গেলেন তীর্থযাত্রায়—উদ্দেশ্য ভারতাত্মার শাশ্বত রূপের সঙ্গে পাশ্চাত্যবাসিনীদের, বিশেষ করে নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এইসময় একদিন আলমোড়ায় কথাপ্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা উঠলে স্বামীজীর মুখ দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আবেগমথিত কণ্ঠে তিনি বললেন, ''আমি বুদ্ধের

দাসানুদাসগণের দাস। তাঁর মতো কেউ কখনও জন্মেছেন কি? স্বয়ং ভগবান হয়েও তিনি নিজের জন্য একটি কাজও করেননি—আর কী হৃদয়! সমস্ত জগৎটাকে তিনি কোলে টেনে নিয়েছেন। এত দয়া যে, রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হয়েও একটি ছাগশিশুকে বাঁচানোর জন্যে প্রাণ দিতে উদ্যত! এত প্রেম যে, এক বাঘিনীর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য নিজের শরীর পর্যন্ত দান করেছিলেন এবং আশ্রয়দাতা এক চণ্ডালের জন্য আত্মবলি দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন।"[৫]

একইসঙ্গে মহৎ আর ননীর মতো কোমলহৃদয় বুদ্ধ নিবেদিতার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর 'বুদ্ধ ও যশোধরা' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''বিশ্বের জন্য নিজেকে বলি দেওয়া খুব ভাল কাজ হতে পারে, কিন্তু তাঁর কী অধিকার যে তিনি নিজ স্ত্রীপুত্রকেও বলি দেন? (তখন) তাঁর মনে হল যে তিনি যে আত্মোৎসর্গ করতে যাচ্ছেন, তাতে স্ত্রী যশোধরারও ভাগ আছে। যশোধরার বিহনে গৌতমের যে দুঃখ হবে, তার ফলেই তিনি স্বামীর তপস্যার ও জ্ঞানের অর্ধেক ভাগ পাবেন।"

নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের ঠিক একবছর পরে অর্থাৎ ১৮৯৯-এর ২৫ মার্চ স্বামীজী তাঁকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করলেন। গতবছরের মতো এইদিনও পুজোর শুরুতে এবং শেষে তিনি বুদ্ধপ্রসঙ্গ করলেন। মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠিতে দিনটির বর্ণনা রয়েছে।

''সকাল ৮টায় মঠে পৌঁছাই। তারপরে মন্দিরে যাই। পূজার পুষ্পাদি না আসা পর্যন্ত আমরা মেঝেয় বসে রইলাম—রাজা (স্বামীজী) বুদ্ধের কথা বলতে লাগলেন। জাতক কাহিনীর তাৎপর্যের কথা, অপরের জন্য পাঁচশো বার জীবনদান করলে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়—এইসব কথা তিনি বলছিলেন। ঠিক সেই সময়ের পক্ষে চমৎকার একটি ভাবব্যঞ্জনা, নয় কি?... পূজা শেষ হলে... পূজাবেদী পুষ্পসজ্জিত করার পরে তিনি বললেন, 'এবার কিছু ফুল আমার বুদ্ধকে দাও।...' "[৬]

লক্ষণীয়, স্বামীজী শিষ্যাকে পরপর দুবছরই তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনে তাঁকে অপরের জন্য জীবনদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের অসংখ্য জাতককাহিনির একটিই তাৎপর্য—অপরের জন্য জীবনদান, যে-আদর্শ নিবেদিতা তাঁর জীবনে রূপায়িত করেছেন। তাই তিনি অনায়াসে বলতে পেরেছেন—নিঃস্বার্থ মানুষই বজ্র।

নিবেদিতার মননে স্বামীজী প্রতিভাত হয়েছিলেন বুদ্ধ অবস্থার জীবন্ত বিগ্রহরূপে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রসঙ্গে ও চিঠিপত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর সেই মনোভাব। শিল্পী নন্দলাল বসু জানিয়েছেন, বোসপাড়া লেনে নিজের পড়ার টেবিলে নিবেদিতা একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি রাখতেন। একদিন তাঁদেরকে মূর্তিটি দেখিয়ে নিবেদিতা প্রশ্ন করলেন—এটি কার মূর্তি? তাঁরা বুদ্ধমূর্তি বলাতে তিনি বললেন—না, এটি স্বামীজীর মূর্তি।

তবে একথা মনে করলে ভুল হবে যে, কেবলমাত্র নিবেদিতার শিষ্যাসুলভ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টির সামনেই স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধরূপে ধরা দিয়েছিলেন। নিবেদিতার সমসাময়িক অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই বুদ্ধের সঙ্গে বিবেকানন্দের অদ্ভুত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশিষ্ট কবি মোহিতলাল মজুমদার 'বাংলার নবযুগ'-এ লিখেছেন, ''বুদ্ধের সহিত তাঁহার (বিবেকানন্দের) আত্মার সগোত্রতা ছিল—তিনিও অতীত ও অনাগত বুদ্ধগণের বংশে জন্মিয়াছিলেন; বুদ্ধের মতোই তিনি যত বড় সন্ন্যাসী, তত বড় প্রেমিক।"[৭] স্বামীজী যখন প্রথমবার আমেরিকা যাবার পথে জাপানে কিছুদিন ছিলেন, তখন বিশিষ্ট শিল্পপতি জামসেদজী টাটাও সেখানে ছিলেন। তিনি পরে একসময় নিবেদিতাকে বলেন, জাপানে সকলেই বুদ্ধের সঙ্গে

স্বামীজীর চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে অবাক হয়েছেন। স্বামীজী নিজেও বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর একাত্মতার কথা প্রকাশ করেছেন অন্তরঙ্গ মহলে। ১৯০৪ সালের ১ ডিসেম্বর নিবেদিতার মিস ম্যাকলাউডকে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় :

''আমরা বজ্রকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে নিয়েছি। ফরাসীরা যেমন নেপোলিয়ানকে বলে L'homme, তাঁকে ইঙ্গিত করবার জন্য আর কোনো কথার দরকার হয় না, তেমনি প্রাচীনকালে বুদ্ধের নাম লেখার পরিবর্তে বজ্র বললেই চলে যেত।

''এবিষয়ে আরও অনেক গভীর কথা আছে, যা এখনি তোমাকে বলতে পারছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই নানা সময়ের কথা স্মরণ করতে পারবে যখন স্বামীজী নিজের সম্বন্ধে বজ্র কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।''[৮]

'বজ্র' প্রতীক সম্বন্ধে নিবেদিতার তীব্র আকর্ষণ ও আবেগের কারণ এই চিঠি থেকে স্পষ্ট। বজ্র তাঁকে পুরাণের দধীচি মুনির আত্মত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিত। তাঁর কাছে বুদ্ধ আর বিবেকানন্দের সমার্থক ছিল 'বজ্র'। একারণেই নিবেদিতা বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধের বজ্র প্রতীক দেখে সেটিকেই জাতীয় প্রতীক করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর পরিকল্পিত ভারতের জাতীয় পতাকায় তিনি ছাত্রীদের দিয়ে লাল কাপড়ের ওপর সোনালি সুতোয় বজ্রচিহ্ন এমব্রয়ডারি করিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বুদ্ধ ও বিবেকানন্দের ভাবে, ত্যাগের আদর্শে স্পন্দিত হোক সমগ্র ভারত।

স্বামীজীর দেহাবসানের অব্যবহিত পরে ১৯০২-এর ২৭ জুলাই মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'The National Significance of the Life of the Swami Vivekananda' প্রবন্ধে নিবেদিতা লেখেন : ''ভারত তাঁর (স্বামীজীর) কাছে হিন্দু, আর্য, এশীয়। সে ভারতের যৌবনকামনা আধুনিক সভ্যতার বিলাসদ্রব্য নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করতে পারে, সে অধিকার নিশ্চয় তার আছে—কিন্তু প্রত্যাবর্তন সে কি করবে না? করবেই, কারণ তার প্রাণের গভীরে আছে নীতি, তপস্যা আর আধ্যাত্মিকতা। গঙ্গাতীরে প্রশান্ত চিত্তে যে-জাতি মৃত্যুপ্রতীক্ষা করে, তার পক্ষে দীর্ঘদিন যান্ত্রিক ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত থাকা সম্ভব নয়।

''বুদ্ধ ত্যাগধর্ম প্রচার করেছিলেন—তার ফলে ভারত দুই শতাব্দীর মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের রূপ ধরল। সে ভারত আবার সকল ধমনীতে তীব্র জীবন-স্পন্দন অনুভব করুক...।''[৯]

বৌদ্ধযুগের এই গৌরবময় ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে নিবেদিতার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন—অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যৎ ভারতের জন্ম হবে—প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারত। তাই দেখা যায়, বৌদ্ধযুগের শিল্প, ইতিহাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি সববিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন এবং যেখানেই ভারতকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে কেউ বঞ্চিত করেছে, সেখানেই তিনি তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন।

এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় রাজগীরের কথা, যা বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের রাজধানী ছিল। নিবেদিতা নিজে রাজগীরে গিয়ে একজন ইতিহাস-গবেষকের মতো সেখানকার বিভিন্ন জায়গার সঙ্গে প্রাচীন পুঁথিতে লেখা জায়গাগুলির বিবরণ মিলিয়ে দেখেছিলেন। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দিয়ে এমন কিছু জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন, যেগুলি বুদ্ধদেবের সময় থেকে তখনও পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে গিয়েছিল। রাজগীরে থাকার সময় এই নতুন আবিষ্কারের কথা তিনি লিখেছিলেন 'Rajgir–an Ancient Babylon' প্রবন্ধে : ''এখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এক আবিষ্কারের জগৎ।... নগরীর মধ্যে এই পথটির মাঝখানে পর্বতের সামনে

একটি বিরাট গুহা চোখে পড়ে।... গুহাটির বাইরের দিক লতাগুল্মে অর্ধেক ঢেকে গেছে।... ৪০৪ খ্রিস্টাব্দে ফা-হিয়েন নগরের মাঝখানে যে-স্তূপ এবং রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে যে-কুয়োর বর্ণনা দিয়েছেন, এই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আজও আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং এই গুহাটি ছিল প্রাচীন রাজগৃহের মুখ্য ধর্মমন্দির। এখানে নিশ্চয়ই বুদ্ধ বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, ধ্যান করতেন, হয়তো বা ধর্মশিক্ষা দিতেন।"[১০]

বৌদ্ধ রাজাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ শিল্পচর্চায় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। শিল্পকলার এই ক্রমবিকাশ এবং পরবর্তী কালে হিন্দু শিল্পকলায় তার প্রভাব নিয়েও নিবেদিতা পড়াশুনো করেছিলেন। এযুগের শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন অজন্তার গুহাচিত্রগুলির প্রতিটি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাদের কালানুযায়ী ভাগ করেন। তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে নন্দলাল বসু, অসিত হালদারদের মতো নবীন শিল্পীদের অজন্তায় পাঠিয়েছিলেন যাতে এই অসাধারণ শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক ধারণা হয়। বুদ্ধের জীবনী ও জাতককাহিনি অবলম্বনে আঁকা চিত্রগুলি যে তাঁর কতটা প্রিয় ছিল তা ধরা পড়েছে মি. ও মিসেস র‍্যাটক্লিফকে লেখা ৩১ মার্চ ১৯১০ তারিখের চিঠিতে :

''অজন্তা বিষয়ে তোমাকে আমি কিছু বলিনি। তার কারণ, মনে হয়নি যে তুমি ও-সম্পর্কে কিছু জানতে চাও। আমি দুঃখিত। পরম সুন্দর তা—সুপ্রাচীন সঙ্ঘারাম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—পার্বত্য নদীর ওপরে ঝুঁকে থাকা গিরিখাঁজের ওপরে তৈরি।... ভাল করে দেখলে বোঝা যায়, এটি ধারাবাহিকভাবে বৌদ্ধধর্মী—ইলোরা যেমন যুগসন্ধির সৃষ্টি, এটি তা নয়। সুতরাং এ হল এক বিচিত্র প্রাচীন ও বিস্ময়জনক অক্সফোর্ড-চরিত্রের। একে ভালবেসে ফেলেছি। তারপর এ হল শিল্প-ইতিহাসের নিদর্শন সমৃদ্ধ।"

বৌদ্ধস্তূপ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে কীভাবে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হয়েছিল সে-সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন (১ সেপ্টেম্বর ১৯১০) : ''এই সপ্তাহে সারদানন্দের সঙ্গে আমি কয়েক ঘণ্টা শিবলিঙ্গের উৎপত্তির বিষয় নিয়ে কাজ করেছি—তিনি সাহায্য করেছেন।... আমি ক্রমেই স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি যে, প্রতীকটি বৌদ্ধস্তূপের ধারাপথে উৎপন্ন। জান কি, মেয়েরা যখন পুজোর জন্য মাটির ছোট-ছোট শিব গড়ে, তখন তারা প্রথমে তাকে একটি ছোট গোল মাটির ওপর বসায়, যাকে তারা বজ্র বলে? তারপর পুজোর সময় প্রথম কাজ হল এই বজ্রটিকে সরিয়ে ফেলা।... এই অপূর্ব বিষয়টি বোঝা উচিত, 'বজ্র' শব্দটি কত বেশি 'বুদ্ধ' শব্দের বদলে ব্যবহার করা হয়। তাহলে দেখছ, হিন্দুধর্মের ইতিহাসের বিষয়ে কিছু করার আশা রাখছিই। তা সত্যই করতে পারলে স্বামীজী কত না খুশি হবেন।"[১১]

প্রশ্ন জাগে, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস-শিল্প-সংস্কৃতি-নিয়ে তাঁর এত গভীর চিন্তন কেন? তার একটাই কারণ—ভারতকে তার অতীত গৌরবের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলা; পাশ্চাত্যের অনুকরণে নয়, প্রাচ্যের আদর্শে। আড়াই হাজার বছর আগে যে-মহামানবের আবির্ভাবের সঙ্গে ভারতবর্ষে এই মহাগৌরবময় যুগের সূচনা হয়েছিল, সেই মহামানব-সম্পর্কিত সব বিষয়ে ছিল নিবেদিতার অসাধারণ শ্রদ্ধা ও সম্মান। তাই যখনই বুদ্ধ ও বৌদ্ধযুগ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে ভুল বা অপমানজনক মন্তব্য শুনতেন, তখনই ক্রোধে জ্বলে উঠতেন এবং যথোচিত ব্যবস্থা নিতেন।

১৩ জানুয়ারি ১৯১০ লন্ডনে আয়োজিত এক সভায় উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মী স্যার জর্জ বার্ডউড ভারতীয় শিল্পরীতিকে অপদস্থ করে মন্তব্য করেন :

''আমার বামপাশের এই-যে বুদ্ধমূর্তির ছবিটি...

অনাদিকাল থেকে সেই-যে একই আকার চলে আসছে, এখানে তার অর্থহীন সমরূপতা দেখছি। এগুলি প্রাণহীন পিতলমূর্তি ছাড়া কিছু নয়—শূন্য, ভাবহীন, মিটমিটে চোখে হাতের বুড়ো আঙুল, হাঁটু ও পায়ের ডগার দিকে তাকিয়ে আছে তো আছেই। সুইট পুডিং (জন্তুর সিদ্ধ চর্বি দিয়ে তৈরি পুডিং) তো একইরকম বাসনাশূন্য পবিত্রতা ও আত্মার প্রশান্তি বোঝাতে পারে।"[১২]

এই সভার তথ্যাদি কলকাতায় পৌঁছনোর পরে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ দীর্ঘ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তার লিখনশৈলী বিচার করলে তা যে নিবেদিতারই লেখা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যটি তিনি শেষ করেছিলেন এইভাবে :

''আর দেরী নয়, আমাদের সভ্যতা ও তার সৃষ্টিসমূহের সমর্থনে আমাদেরই দাঁড়াতে হবে—অন্য কারো ধার আমরা ধারি না।"[১৩]

এটি ছিল তাঁর প্রাণের গভীর কথা। বাস্তবিক, বৌদ্ধশিল্প-নিদর্শনগুলি তিনি তাঁর সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন : ''জনসাধারণ যদি আমার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনও অর্থদান করে, তা যেন মিউজিয়াম এবং ঐতিহাসিক স্থানে রক্ষিত বৌদ্ধ ভাস্কর্যের প্রতিরূপ করার কাজের পুরস্কাররূপে ব্যয়িত হয়।"

নিবেদিতার এই একই রূপের প্রকাশ দেখা যায় যখন সিংহলি বৌদ্ধ অনাগারিক ধর্মপাল, শৈব মোহন্ত দ্বারা পরিচালিত বুদ্ধগয়া মন্দিরে বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। বুদ্ধগয়ায় নিবেদিতা বেশ কয়েকবার গেছেন এবং স্বামীজীর মতো তিনিও বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের শাখা বলে মনে করতেন : ''বুদ্ধ একজন হিন্দু আচার্য ছিলেন, তবে ঐ সময়ের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের। তাঁর অনুগামীরা হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিজেদের নূতন সম্প্রদায় বলে মনে করতেন না, তবে জানতেন, তাঁরা প্রতিবেশিদের চেয়ে সৎ ও ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দু।... সারা বৌদ্ধযুগে হিন্দুধর্ম জীবন্ত ছিল, যদিও বৌদ্ধ লেখকেরা এ বিষয়ে নীরব।... হিন্দুদের অত্যাচারে বৌদ্ধরা ভারত থেকে বিতাড়িত, এ ইতিহাস আমার কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তা কখনও ছিল না।" ধর্মপালের সংকীর্ণ মনোভাব নিবেদিতার কাছে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল; বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ও লেখালিখি করে তিনি এই অন্যায় প্রচেষ্টা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলেন। এ-বিষয়ে যাতে স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় বেরোয় তার জন্য তিনি স্টেট্‌সম্যানের সম্পাদক মি. র‍্যাটক্লিফকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। শুধু তাই নয়, শৈব মোহন্তের অধিকার কেড়ে নিয়ে ধর্মপালের হাতে কর্তৃত্বভার দেওয়ার জন্য লর্ড কার্জনের মতলব তিনি গোপন নথি থেকে ফাঁস করে দেন।

ভগবান বুদ্ধকে অনুসরণ করার আদর্শ নিবেদিতা গুরুর থেকেই লাভ করেছিলেন। সেই আদর্শে, জগতের জন্য নিজের জীবনকে আহুতি দেওয়ার ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন, আর তার পরিপূর্ণতার জন্য এভাবেই সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর অন্তরলোকে যেমন বুদ্ধের এক বিশেষ স্থান ছিল, তেমনি তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ডের মধ্যেও ছিল বুদ্ধ-সম্পর্কিত সব কিছুকে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করে সেই গৌরবময় অতীতকে আরও একবার ফিরিয়ে আনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে নিবেদিতা, যে-পল্লিতে সুজাতা বাস করতেন, সেখানে যান। স্থানটিতে সুজাতার গৃহের চিহ্নমাত্র ছিল না, তবুও নিবেদিতা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। সেখানকার একখণ্ড মাটি তুলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে বললেন, সমগ্র স্থানটি ভারি

পবিত্র কারণ সুজাতাই ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। তিনি যথাসময়ে বুদ্ধকে আহার্য দিয়েছিলেন।

নিবেদিতার ধ্যানলোকে বুদ্ধ কীভাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন তা প্রকাশিত হয়েছে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতায়, ব্যক্তিগত পত্রালাপে। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও হিতৈষিণী মিসেস সারা বুলকে লেখা একটি চিঠির অংশ :

''আমার ডেস্কের উপরে ছোট্ট বুদ্ধমূর্তিটি। দেখছি আর ভাবছি—কী প্রশান্তভাবে সমাসীন—শুধু তিনি—চিন্তার মহাদেশে অভিযাত্রী—চিরযাত্রী—ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে—নিঃসঙ্গ। আবেগের স্নায়ুকেন্দ্রে স্থাপিত তাঁর হাত—কিন্তু কোনো কাঁপন নেই তাতে। যে-সমুদ্রে নাবিক তিনি সেখানে দুর্বলতার তরঙ্গদোলা তাঁকে বিচলিত করে না—তিনি একাকী—অনন্তে।''[১৪]

১৯০৪-এর ১৩ নভেম্বর কলকাতা থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সঙ্গে তাঁর একদিনের কথোপকথনের বিবরণ :

''শ্রীমাকে বললাম, 'তুমি এখনো তাঁর 'গন্ডার কন্যা' রয়ে গেছ; তারপর এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের সুমহৎ উক্তিও শোনালাম।' ''

সুমহৎ সেই উক্তিটি হল ধর্মপদের একটি পদ, যা স্বামীজী প্রায়ই ভাবের সঙ্গে আবৃত্তি করতেন—

''পথহীন পথে অগ্রসর হও!
নির্ভয়ে, বিনা ভ্রূক্ষেপে
একাকী বিচরণ করো গন্ডারের মতো।
শব্দে ভীত নয় সিংহ,
জালে বদ্ধ নয় বায়ু,
জলে লিপ্ত নয় পদ্মপত্র—
নিঃসঙ্গ এদেরি মতো, বিচরণ করো
গন্ডারের মতো।''[১৫]

স্বামীজী মার্গারেটের মধ্যে দেখেছিলেন এক সিংহিনীকে। কিন্তু ভারতে এসে নানা প্রতিকূলতা, সর্বোপরি যাদেরকে ভালবেসে নিজেকে নিঃশেষ করেছিলেন তাদের দেওয়া আঘাতে ক্ষতবিক্ষত নিবেদিতাকে বোধহয় এই নিঃসঙ্গ, একাকী গণ্ডারের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হয় না। 'নির্ভয়ে, বিনা ভ্রূক্ষেপে' সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে তিনিই পেরেছিলেন নিজের জীবনে জাতককাহিনিকে সত্য করে তুলতে। ✠

তথ্যসূত্র

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১১৪

২। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ১০৬৫

৩। দ্রঃ ভগিনী নিবেদিতা, *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৯), পৃঃ ১৫৫

৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৯৮), খণ্ড ১, পর্ব ১, পৃঃ ১৬৮

৫। *দ্রঃ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ৯, পৃঃ ১৭৬

৬। *নিবেদিতা লোকমাতা*, খণ্ড ১, পর্ব ১, পৃঃ ৫০

৭। অরুণকান্তি সাহা, *অমিতাভ বুদ্ধ* (শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি : কলকাতা, ১৩৮৯), পৃঃ ১৬৬

৮। *নিবেদিতা লোকমাতা* (১৩৯৮), খণ্ড ১, পর্ব ২, পৃঃ ৩১৪

৯। তদেব, পর্ব ১, পৃঃ ১৩৬-৩৭

১০। দ্রঃ নিবেদিতা, *ভারতচেতনা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ১৯৮৪), পৃঃ ৮৩

১১। দ্রঃ *নিবেদিতা লোকমাতা*, খণ্ড ৪ (১৪০১), পৃঃ ১৬৮

১২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৭১

১৩। তদেব, পৃঃ ৭০ ১৪। তদেব

১৫। তদেব, খণ্ড ১, পর্ব ১, পৃঃ ১৮৯